ইনফাক
ফি সাবিলিল্লাহ

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রাহি.)

প্রকাশক	:	**আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম** চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭। ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯ ফ্যাক্স ঃ ৯৩৩৯৩২৭
প্রথম প্রকাশ	:	জানুয়ারি - ১৯৮৯
৫০তম মুদ্রণ	:	**এপ্রিল ২০২৫, বৈশাখ ১৪৩২, শাওয়াল ১৪৪৬**
নির্ধারিত মূল্য	:	২০.০০ (বিশ) টাকা মাত্র।
মুদ্রণে	:	আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

Infaq-fi-Sabilillah, By Maulana Motiur Rahman Nizami (Rah.), Published by : Abu Taher Mohammad Ma'sum, Chairman, Publication Department, Bangladesh Jamaate Islami, 505 Baro Moghbazar, Dhaka-1217.

Net Price : 20.00 (Twenty) taka only.

লেখকের আরজ

'ইন্‌ফাক ফি সাবিলিল্লাহ' পুস্তিকাটির প্রথম সংস্করণ অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষ হ'য়ে যাওয়ায় মহান আল্লাহর দরবারে প্রাণ উজাড় করে শুকরিয়া জানাই। মূলতঃ এটা আল্লাহর দ্বীনের জন্যে তার বান্দাহদের মধ্যে জানের কোরবানী ও মালের কোরবানীর অদম্য প্রেরণারই বহিঃপ্রকাশ।

এ পুস্তিকাটি লেখকের তেমন কোন জ্ঞান গবেষণার ফল নয়। মাঠে ময়দানে আল্লাহর দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত থাকার ফলশ্রুতিতে কুরআন সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত হেদায়েতের ন্যূনতম প্রকাশ মাত্র। যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার এক নগণ্য বান্দাহর মনে তিনি নিজেই দয়া করে- মেহেরবানী করে প্রদান করেছেন।

১৯৮৫ সনের কোন এক সময়ে রাজশাহী জেলা শাখার বাছাই করা দায়িত্বশীল পর্যায়ের ২০/২৫ জন কর্মীর উদ্দেশ্যে আয়োজিত একটি শিক্ষা বৈঠকে সম্ভবতঃ শেষ রাতের পবিত্র মুহূর্তে আমাকে এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে হয়েছিল। ৪৫ মিনিটের সেই বক্তৃতাটি খুব বেশি সাজানো গোছানোভাবে পেশ করেছিলাম বলে আমার মনে হয়নি। বক্তৃতা শেষে রাজশাহী জেলার তৎকালীন আমীর অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাহেব উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রতি 'ইন্‌ফাক ফি সাবিলিল্লাহ' এই বক্তব্যের উপর আমলের আহ্বান জানালেন। উপস্থিত মুষ্ঠিমেয় অল্প আয়ের ভাইয়েরা ক্ষেতের ধান থেকে এককালীন যা দেয়ার ওয়াদা করলেন তার পরিমাণ ছিল দেড়শ মণেরও কিছু বেশি।

এ দৃশ্য দেখে আমি উৎসাহিত হলাম। এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা তৈরির সিদ্ধান্ত সেই মুহূর্তেই গ্রহণ করলাম। অবশ্য অনেকেই এ বিষয়ে কিছু

লেখার পরামর্শও দিয়েছেন। লেখার সুবিধার্থে উক্ত বক্তৃতার ক্যাসেটটি চেয়ে নিলাম। কিন্তু পরে আর এর উপর মাল মশলা যোগাড় করে ভাল একটু কিছু লেখার সুযোগ হয়নি। পরিশেষে ক্যাসেট থেকে তৈরি করা অনুলিপি দ্রুত ছাপতে দিতে বাধ্য হলাম ১৯৮৯ সালের বাইতুলমাল পক্ষের প্রয়োজনে। ইচ্ছা ছিল পরে আরো কিছু সংযোজনের, কিন্তু সময় সুযোগের অভাবে তা আর হয়ে উঠেনি।

পরের বছর আবার বাইতুলমাল পক্ষ এসে হাজির। নিজের পক্ষে সংযোজনের হক আদায় পুরোপুরি সম্ভব হলো না। অথচ পরবর্তী সংস্করণ আগের মতই ছেপে আসুক এটাও মন চায় না। তাই অগত্যা ছোট ভাই নওশাদ মুহাম্মদ ফরহাদের সহযোগিতায় সামান্য কিছু যোগ করে পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার প্রয়াস পেলাম। ময়দানে সংগ্রামরত দ্বীনের ঝান্ডাবাহীদের মাধ্যমে যাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছবে, তাদেরকে মহান আল্লাহ দ্বীন কায়েমের এ আন্দোলনে মাল ও জানের কোরবানীর তৌফিক দিন। আমার এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাকে আল্লাহ এই কোরবানীর জযবা সৃষ্টির উপায় হিসাবে কবুল করুন। আমীন ॥

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইন্‌ফাক ফি সাবিলিল্লাহ

বর্তমান দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন চলছে তা মূলতঃ আজকের সময়ের দাবী। এভাবে অতীতে যখনই মানবতা-মনুষ্যত্ব বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে তখনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী রাসূলের আগমন ঘটেছে, সে বিপর্যয় থেকে মানব জাতিকে উদ্ধার করার জন্য। যেহেতু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) শেষ নবী, তার পরে আর কোন নবী আসবে না, তাই আজকের বিপর্যস্ত মানব সমাজকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ তাআলা কোন নবী পাঠাবেন না। কিন্তু নবীদের পদাংক অনুসারী আল্লাহর কিছু বান্দাহর মাধ্যমেই তিনি এ মহান কাজটি আঞ্জাম দেওয়াবেন। বস্তুতঃ কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে আল্লাহর দ্বীন পৌঁছানোর দায়িত্ব, আল্লাহর বাঞ্ছিত পথে মানব গোষ্ঠীকে পরিচালনার দায়িত্ব উম্মতে মোহাম্মদীর উপর অর্পিত। উম্মতে মোহাম্মদী হিসেবে সাধারণভাবে এ দায়িত্ব সকলের। বিশেষভাবে সর্বকালে সর্বযুগে একটি দলকে একাজে অবশ্য অবশ্যই নিয়োজিত থাকতে হবে। এটাই আল্লাহর নির্দেশ এবং আল্লাহর শেষ নবীর প্রত্যাশা। এই আলোকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আজকের দিনের ইসলামী আন্দোলন নবী রাসূলদের সে আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতা। বিশেষ করে শেষ নবীর পক্ষ থেকে তার উম্মতের উপর অর্পিত বিশেষ দায়িত্ব পালন ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব এ আন্দোলনে যারা শরীক, তারা নবী রাসূলদের বিশেষ করে শেষ নবীর সার্থক উত্তরসূরী। তাই এই আন্দোলন সংগ্রামের ময়দানে ঐতিহ্য হিসেবে অনুসরণ করবে একমাত্র নবী রাসূলদের বিশেষ করে শেষ নবীর ঐতিহ্য।

এ আন্দোলনের কর্মীগণও ঐতিহ্য হিসেবে অনুসরণ করবে নবী রাসূলগণ ও তাদের সরাসরি তৈরি লোকদের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য, বিশেষ করে শেষ নবী ও তার প্রিয় সাহাবায়ে কেরামগণের ঐতিহ্য।

নবী রাসূলগণ ও তাদের সার্থক উত্তরসূরী-কুরআন যাদেরকে ছিদ্দিকীন, সালেহীন ও শোহাদা নামে অভিহিত করেছে, তারা যুগে যুগে মানব

জাতিকে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির পথ দেখানোর পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছেন পরিপূর্ণ দ্বীন কায়েমের আন্দোলনের মাধ্যমে। উক্ত আন্দোলনকে আল কুরআনে "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ" নামে অভিহিত করা হয়েছে। উক্ত জিহাদকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের দাবী পূরণের এবং আখেরাতের নাজাতের একমাত্র উপায় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে উক্ত জিহাদে আল্লাহ তাআলা তার ঈমানদার বান্দাহদের কাছে দুটো জিনিসের কোরবানী দাবী করেছেন। একটি মাল, অপরটি জান। আল কুরআনের ঘোষণা-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদেরকে কি আমি এমন একটা উপায় বলে দেব যা তোমাদেরকে আখেরাতে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে নাজাত দিতে সক্ষম। ঈমান আন আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি আর জিহাদ করো আল্লাহর পথে মাল দিয়ে, জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম-যদি তোমরা প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হও।" সূরা আস ছফ ঃ ১০ ও ১১ নং আয়াত।

আল্লাহ তাআলার উপরিউক্ত নির্দেশের আলোকে আখেরাতের নাজাতের উদ্দেশ্যে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাদের উত্তরসূরীগণ আল্লাহ এ জমিনে এবং মানুষের জীবনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে (জিহাদ) যে ঐতিহ্য রেখে গেছেন তা মূলতঃ মাল ও জান কোরবানীর ঐতিহ্য। অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাদের সংগী সাথীদের ইতিহাস বিস্তারিত জানার সুযোগ না থাকলেও আল কুরআনে শেষ নবী ও তার সাথী সঙ্গীদের উদ্বুদ্ধ করণের জন্যে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও বারবার আল্লাহ তাআলা ইশারা ইঙ্গিত দিয়েছেন। আমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার জন্যে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং তার প্রিয় সাহাবায়ে কোমরামগণের নজিরবিহীন ত্যাগ ও কোরবানীর বিস্তারিত বর্ণনা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। যা মূলতঃ সুরায়ে ছফে উল্লেখিত ১০, ১১ নং আয়াতের জীবন্ত

নমুনা। তারা আল কুরআনের উক্ত নির্দেশের আলোকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সত্যিকার অর্থে-ঈমান এনেছেন। আল্লাহর রাসূলের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে ঈমানের দাবী পূরণে যথার্থ ভূমিকা ও কোরবানী পেশ করেছেন। প্রয়োজনে জানের কোরবানী দিতেও পিছপা হননি।

ইতিহাস সাক্ষী, নবী রাসূলগণের মাধ্যমে পরিচালিত আন্দোলনে শরীক লোকেরা আন্দোলনের প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ সংগ্রহের জন্য অন্য কারো মুখাপেক্ষী ছিলেন না। যারাই আন্দোলনে শরীক হয়েছেন তারাই- আন্দোলনের উপায় উপকরণ সংগ্রহ করেছেন নিজেদের মালের কোরবানীর মাধ্যমে। শেষ নবী এবং তার সাথীদের ইতিহাস, ইতিহাসের আরো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা কেয়ামত পর্যন্ত এ পথের পথিকদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আজকের দিনে আল্লাহর দ্বীন এমন একদল আল্লাহর বান্দাহর মাধ্যমে বিজয় লাভে সক্ষম হবে যারা শেষ নবীর হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরামের ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। সাহাবায়ে কেরাম মাল ও জানের কোরবানীর যে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন- তার প্রেরণার উৎস ছিল আল্লাহর কুরআন ও এবং রাসূলের সুন্নাহর সার্থক অনুসরণ। তাই আমরা এটাকে উপলব্ধি করার জন্য এ পর্যায়ে আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাহর মূল দিক নির্দেশনা উপলব্ধি করার চেষ্টা করবো। এ জন্যে 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র কাজে মালের কোরবানী বা ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর গুরুত্ব প্রসংগে আল কুরআনের কিছু আয়াত- বরং রাসূলের কিছু হাদীস ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই পেশ করতে চাই।

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ط لَايَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ
وَقٰتَلَ ط اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ
وَقٰتَلُوْا ط وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرٌ ○ مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ
وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ○

"আল্লাহর পথে খরচের ব্যাপারে তোমাদের আপত্তির এমন কি কারণ থাকতে পারে? অথচ আসমান ও জমিনের সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর। তোমাদের মধ্যে থেকে যারা বিজয়ের পরে ব্যয় ও জিহাদ করিবে তারা কখনও সেই লোকদের সমান হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জিহাদ করেছে। তাদের মর্যাদা পরে ব্যয় ও জিহাদকারীদের তুলনায় অনেক বেশী ও বিরাট। অবশ্য আল্লাহ সবার জন্যে উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে ওয়াকেফহাল আছেন। আল্লাহকে উত্তম করজ দেয়ার মত কেউ আছে কি? যদি কেউ এভাবে করজ দিতে এগিয়ে আসে তাহলে আল্লাহ তাকে অনেক গুণ বেশি প্রতিদান দেবেন। তার জন্যে রয়েছে আরও সম্মানজনক প্রতিদান।" (সূরা আল হাদীদ ঃ ১০-১১)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا
مَنًّا وَّلَآ اَذًى لا لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج

"যারা আল্লাহর পথে মাল খরচ করে, অতঃপর এ কারণে খোটা দেয় না, এবং কষ্ট দেয় না, তাদের রবের নিকট তাদের জন্যে যথার্থ প্রতিদান রয়েছে।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৬২)

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ○

"তোমরা তোমাদের সম্পদ থেকে যা কিছু খরচ করে থাক তার যথার্থ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে। তোমাদের উপর কোনরূপ অবিচার করা হবে না" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৭২)

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ
بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ج اَللّٰهُ
يَعْلَمُهُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ
وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ○

"তাদের মুকাবিলার জন্যে তোমরাও সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ কর, আর সজ্জিত ঘোড়া নিয়ে সদা প্রস্তুত থাক, যাতে আল্লাহর দুশমন এবং তোমাদের দুশমনকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে সক্ষম হও। এদের ছাড়া এমন দুশমনদেরকেও মুকাবিলা করতে হবে, যাদের তোমরা চেন না, আল্লাহ জানেন। আর আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছুই খরচ কর, তার প্রতিফল তোমরা অবশ্যই পাবে, তোমাদের উপর কোনরূপ জুলুম করা হবে না।" (আনফাল ঃ ৬০)

قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ۝

"আমার ঈমানদার বান্দাহদের বলে দাও, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে, গোপনে অথবা প্রকাশ্যে; সেইদিন আসার আগেই যেদিন কোন কেনা-বেচার সুযোগ থাকবে না, যেদিন কোন বন্ধুত্ব কাজে আসবে না।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ৩১)

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

"যারা আল্লাহর পথে তাদের মাল খরচ করে তাদের এই খরচকে এমন একটি দানার সাথে তুলনা করা চলে যা জমিনে বপন বা রোপণ করার পর তা থেকে ৭টি ছড়া জন্মে এবং প্রতিটি ছড়ায় একশতটি করে দানা থাকে। এভাবে আল্লাহ যাকে চান বহুগুণ পুরস্কার দিতে পারেন। আল্লাহ সুবিশাল ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৬১)

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ لا فَاَصَّدَّقَ

وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا

ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

"আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই। অন্যথায় অনুতাপ-অনুশোচনা করে বলতে হবে, হে পরোয়ারদেগার, আমাকে যদি অল্প কিছু সময়ের জন্যে অবকাশ দিতে, তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং নেক লোকদের একজন হতে পারতাম! কারো মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আসার পর আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিবহাল।" (সূরা আল মুনাফিকুন ঃ ১০-১১)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط

فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ط وَالَّذِيْنَ

كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ○

"কাফেরগণ তাদের মাল খরচ করে আল্লাহর পথে বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যে। এভাবে অচিরেই এই মাল খরচ তাদের অনুতাপ-অনুশোচনা ও দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। অতঃপর তাদের পরাভূত হতে হবে। পরিণামে কাফেরদের জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে।" (সূরা আনফাল ঃ ৩৬)

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ج

وَاَحْسِنُوْا ج اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

"খরচ কর আল্লাহর পথে, নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। উত্তমরূপে নেক কাজ আঞ্জাম দাও। এভাবে যারা নেক কাজ উত্তমরূপে আঞ্জাম দিতে যত্নবান আল্লাহ তাদের অবশ্যই ভালবাসেন।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৫)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনে রাখ, আহবার ও রোহবানদের (ইহুদী ও নাসারাদের ধর্মগুরুগণ) অধিকাংশই অন্যায় ও অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করে থাকে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। যারা সোনা-রূপা সঞ্চয় করে, আর তা আল্লাহর রাহে খরচ করে না, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।" (সূরা আত তওবা ঃ ৩৪-৩৫)

هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۗ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ۝

"তোমরাতো এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহর পথে খরচের জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতার আশ্রয় নেবে, তার পরিণামে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। অথচ তোমরাই তাঁর মুখাপেক্ষী। যদি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, তাহলে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। তিনি

তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন সম্প্রদায়কে একাজের দায়িত্ব দেবেন; অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না।" (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৮)

ইনফাকের গুরুত্ব প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণিত হাদীসগুলোও আমরা সামনে রাখতে পারিঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اَنْفِقْ يَا اِبْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ – متفق عليه

"হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা মানব সন্তানকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি খরচ কর, তোমার জন্যে খরচ করা হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

وَعَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْفِقْ وَلَا تُحْصِىْ فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَلَا تُوْعِىْ فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ اِرْضَخِىْ مَا اَسْتَطَعْتِ – متفق عليه

"হযরত আসমা (রা.) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল (সা.) তাঁকে বলেছেন, খরচ কর, কত খরচ করলে তা বড় করে দেখার জন্যে হিসাব করতে যেও না- তা হলে আল্লাহ তোমার বিপক্ষের জমা ভাল করে সংরক্ষণ করবেন। তোমার সাধ্যমত খরচ কর।" (বুখারী ও মুসলিম)

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اِبْنَ اٰدَمَ اَنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَاَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تَلَامُ عَلٰى كَفَافٍ وَابْدَأْ لِمَنْ تَعُوْلُ – رواه مسلم

"আবু উমামা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, হে আদম সন্তান, যদি তোমার উদ্বৃত্ত সম্পদ খরচ কর তাহলে তা তোমার জন্যে কল্যাণকর হবে। আর যদি তা সঞ্চয় করে রাখ তাহলে তা হবে তোমার জন্যে অকল্যাণকর। তবে হ্যাঁ, তোমার জীবন ধারণের ন্যূনতম সম্পদের জন্যে তোমাকে পাকড়াও করা হবে না। এ খরচের সূচনা কর তোমার পরিবার থেকেই।" (মুসলিম)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَقَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِىٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ - رواه الترمذى

"হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, দানকারী আল্লাহর নিকটতম, বেহেশতের নিকটতম এবং মানুষেরও নিকটতম হয়ে থাকে। আর দূরে থাকে দোযখ থেকে। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি অবস্থান করে আল্লাহ থেকে দূরে, বেহেশত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে, দোযখের নিকটে। অবশ্য অবশ্যই একজন জাহেল দাতা একজন বখিল আবেদের তুলনায় আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয়।" (আত তিরমিযি)

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর অর্থ

আমরা উপরে আল কোরআনের কিছুসংখ্যক আয়াতের ও কতিপয় হাদীসের শুধু তরজমাসহ উদ্ধৃতি দেয়ার প্রয়াস পেয়েছি। উক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ'র কথাটি বার বার এসেছে। আমরা এ অধ্যায়ে পৃথক পৃথকভাবে 'ইনফাক' ও 'ফি সাবিলিল্লাহর' অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝতে প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ইনফাকের অর্থ

ইনফাকের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ঃ ইনফাক শব্দটির মূল ধাতু (نفق) যার অর্থ সুড়ঙ্গ। যার একদিক দিয়ে প্রবেশ করে আর একদিক দিয়ে বের হওয়া যায়।

মুনাফিক এবং নিফাক শব্দদ্বয়ও এই একই ধাতু থেকে গঠিত। অর্থের দিক দিয়ে মোটামুটি একটা সামঞ্জস্য আছে। 'নাফাকুন' থেকে ইনফাক গঠিত হয়েছে। যখন মাল খরচের অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে তখন এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম দিক লুকিয়ে থাকছে। তাহলে মুমিনের মাল-সঞ্চিত হয়ে থাকবার জন্যে নয়। একদিক থেকে যেমন আয় হবে তেমনি অপরদিকে তা ব্যয় হয়ে যাবে।

এই 'নাফাকুন' থেকে যখন মুনাফিক শব্দটি গঠিত হচ্ছে, তখন তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে- মুনাফিক ঈমানের কথাকে দিলে বদ্ধমূল করে নিচ্ছে না। এক কান দিয়ে শুনছে আর এক কান দিয়ে বের করে দিচ্ছে।

নাফাকুন ধাতু থেকে আবার নাফাকাতুন শব্দটিও গঠিত হয়েছে। যা ভরণ-পোষণ বা খোরপোষের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শাব্দিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা ইনফাকের অর্থ করে থাকি মাল খরচ করা। কিন্তু যেমন তেমন খরচকে ইনফাকের পর্যায়ে ফেলা যায় না। আমাদের সমাজে প্রচলিত 'চাঁদা' বলতে যা বুঝায় 'ইনফাক' তা থেকে অনেক বড় কিছুকে বুঝায়। চাঁদা একটি ফার্সি শব্দ যার অর্থ 'যৎকিঞ্চিত'। নিজের অর্থ-সম্পদের মধ্য থেকে যৎকিঞ্চিত কোন ব্যক্তিকে বা প্রতিষ্ঠানকে বিলিয়ে দিলেই চাঁদার হক আদায় হয়ে যায়। কিন্তু 'ইনফাকের' হক এতে আদায় হয় না।

শাব্দিক অর্থের আলোচনায় আমরা ইনফাকের দুটো দিক পেয়ে থাকি।

একঃ এ পরিমাণ খরচ করতে হবে যাতে অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়ের সুযোগ না আসে বা দাতার মনে সঞ্চয়ের ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার সুযোগ না আসে।

দুইঃ ভরণ-পোষণ বা খোরপোষের অর্থের তাৎপর্য হল দাতা যার জন্যে দান বা খরচ করবে তার প্রয়োজন পূরণ করার মত অর্থ অবশ্যই ব্যয় করবে।

ফি সাবিলিল্লাহর অর্থ

আমরা উপরে যে আয়াতগুলো আলোচনায় এনেছি সেখানে শুধু 'ইনফাকের' কথা বলা হয়নি বরং 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়,

উল্লিখিত আয়াতগুলোর প্রতি একটু মনোনিবেশ করলেই আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে যে, ফি সাবিলিল্লাহর সাথে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ অথবা কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। অতএব আল কোরআনে ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর আহ্বান মূলতঃ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অর্থ ব্যয়কেই বুঝানো হয়েছে।

অবশ্য ফি সাবিলিল্লাহ কথাটি ব্যাপক অর্থেও ব্যবহৃত হওয়ার অবকাশ আছে। সাধারণভাবে গরীব-দুঃখী মিসকিনকে সাহায্য করাকেও ফি সাবিলিল্লাহ হিসাবে আল্লাহ নিজেই গণ্য করেন। তেমনি যে কোন সেবামূলক কাজও ফি সাবিলিল্লাহর কাজ হিসাবে পরিগণিত হওয়ার অবকাশ আছে। তবে এগুলো ফি সাবিলিল্লাহর মৌলিক কাজ নয়। মৌলিকভাবে ফি সাবিলিল্লাহ বলতে জিহাদ এবং কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ বুঝায়। আল কোরআনের উপস্থাপনা ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

'ইনফাকের' অর্থ এবং 'ফি সাবিলিল্লাহর' অর্থ একত্রে মিলালে ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর অর্থ দাঁড়ায় ঃ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রয়োজন পূরণ, এর উপায়-উপকরণ যোগাড় ও এই মহান কাজটি পরিচালনার জন্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্যে অর্থসম্পদ খরচ করা। চাঁদার মনোভাব নিয়ে অর্থ দান করার মাধ্যমে এর হক আদায় হতে পারে না। তাই ইসলামী আন্দোলনের অর্থনৈতিক সহযোগিতার ব্যাপারে চাঁদার পরিভাষা ব্যবহার না করে 'এয়ানাত' এই আরবী শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ সহযোগিতা দান।

ইনফাকের তাৎপর্য

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার খাতে আমাদেরকে মাল সম্পদ খরচ করতে হবে কেন?

আল্লাহ-তাআলা তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর পথে জিহাদের যে আহ্বান দিয়েছেন তার মধ্যেই উপরিউক্ত প্রশ্নটির উত্তর রয়েছে। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা ঃ "তোমরা জিহাদ কর আল্লাহর পথে মাল দিয়ে এবং জান দিয়ে।" অর্থাৎ দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই জিহাদে বা সংগ্রামে মালের কোরবানী এবং জানের কোরবানীর প্রয়োজন আছে। এই দুটো জিনিসের কোরবানী দেয়ার মত একদল মর্দে মুমিন, মর্দে মুজাহিদ তৈরি হলেই আল্লাহর দ্বীন কায়েমের

সংগ্রাম বিজয় হবে। যেমন বিজয়ী হয়েছিল রাসূলে পাক (সা.) এর নেতৃত্বে সাহাবায়ে কেরামের (রা.) মালের কোরবানী ও জানের কোরবানীর বিনিময়ে। আল্লাহর দ্বীন কায়েমের এই মহান সংগ্রাম দাবী করে যে এ সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের কাছে তাদের নিজের জান ও মালের তুলনায় তথা ইহ-জাগতিক যাবতীয় স্বার্থ ও লোভ-লালসার তুলনায় আল্লাহর রহমত ও সন্তোষই হতে হবে অধিকতর প্রিয়। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

"তাদের আল্লাহর পথে লড়াই করা উচিত যারা আখেরাতের বিনিময়ে এই দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করতে পারে। আর যারাই আল্লাহর পথে সংগ্রামে অংশ নেবে অতঃপর নিহত হবে অথবা বিজয়ী হবে, উভয় অবস্থায় আমি তাদেরকে মহান প্রতিদানে ভূষিত করব।" (সূরা আন-নিসা ঃ ৭৪)

উল্লিখিত আয়াতে কথা পরিষ্কারভাবে এসেছে। আল্লাহ তাআলা যাকে-তাকে দ্বীন কায়েমের লড়াইয়ের অংশ নিতে বলেননি। যারা এই দুনিয়ার জীবনের তুলনায় আখেরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দিতে সক্ষম, কেবলমাত্র তারাই এ কাজের যোগ্য। আর যারা এর বিপরীত অর্থাৎ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় তারা এ কাজের যোগ্য হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কেও বলেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ○

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়ার ডাক দিলে তোমরা মাটি কামড়ে ধর। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ দুনিয়ার এই মাল মাত্রা আখেরাতে অতি সামান্যই কাজে আসবে।" (আত-তওবা ঃ ৩৮)

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পথে চলার ক্ষেত্রে এই দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের মোহই প্রধান অন্তরায়। এই মোহ কাটিয়ে উঠতে যাতে আমরা সক্ষম হই সে জন্যেই আল্লাহ তায়ালা আমাদের জানের কোরবানী পেশ করার ব্যাপারে বেশি বেশি করে তাকিদ করেছেন। এভাবে আল্লাহর পথে বেশি বেশি করে মাল খরচের মাধ্যমেই আমরা দুনিয়ার বৈষয়িক ও পার্থিব জীবনের মোহ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হতে পারি এবং আল্লাহর পথে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যেতে পারি। আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের প্রধান উদ্দেশ্য এটাই।

মানুষের কাছে তার জান এবং মাল দুটোই প্রিয়। কখনও মানুষ তার জান বাঁচানোর জন্যে সমস্ত মাল-সম্পদ লুটিয়ে দিতে যেমন পরোয়া করে না তেমনি আবার মাল-সম্পদের মোহ চরিতার্থ করতে গিয়ে জীবন বিপন্ন করতেও পিছপা হয় না। এ দুয়ের মাঝে আল্লাহ তাআলা মালের কোরবানীকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, কারণ এই পার্থিব জগতের মায়া-মহব্বতের তুলনায় আখেরাতের মায়া-মহব্বত ও চিন্তা-চেতনা অধিক না হলে কেউ আল্লাহর পথে, আল্লাহর নামে জান দিতে পারে না। অপরদিকে আল্লাহর পথে বেশি বেশি মাল খরচের অভ্যাস না হলে পার্থিব জগতের লোভ-লালসা ও মোহ পরিহার করে আখেরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দানের মত মন-মানসিকতা তৈরি হতে পারে না।

তাই নিজেকে আল্লাহর পথে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে, আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সংগ্রামের যথার্থ দাবী পূরণে নিজেকে যোগ্য বানানোর স্বার্থে আমাদেরকে ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর' প্রয়োজন প্রসঙ্গে দ্বিতীয় যে দিকটি আমাদেরকে বিবেচনায় রাখতে হবে, তাহলো আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সংগ্রাম বিজয়ী হওয়ার জন্যেও "জনশক্তি এবং অর্থশক্তিতে" বলিয়ান হওয়া অপরিহার্য্য। এ কারণেও আল্লাহ তাআলা এই সংগ্রামে মাল ও জান দিয়ে শরীক হওয়ার ডাক দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ আমাদেরকে এ সত্যটিও সামনে রাখতে হবে যে, ইসলামী আন্দোলন অতীতেও কোনদিন নিছক অলৌকিকতার ভিত্তিতে

বিজয়ী হয়নি সামনেও হবে না। আম্বিয়ায়ে কেরাম বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) কে স্বাভাবিকভাবেই দাওয়াতী তৎপরতার মাধ্যমে জনশক্তি যোগাড় করতে হয়েছে এবং এই জনশক্তির আর্থিক কোরবানীর দ্বারাই আন্দোলনের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ যোগাড় করতে হয়েছে। অলৌকিকতা বা মু'জেযা নবী-রাসূলদের জীবনে সংঘটিত অবশ্যই হয়েছে কিন্তু তা সংঘটিত হয়েছে একদিকে নবুওয়াতের প্রমাণ হিসাবে, অপরদিকে কোন কওমকে ধ্বংসের আগে আল্লাহর পক্ষে যুক্তি-প্রমাণাদির পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্যে। "এছবাতে নবুওয়াত" ও "এজমালে হুজ্জাত"- এই দুই কারণে নবী-রাসূলদের যিন্দেগিতে অসংখ্য মুজেযা সংঘটিত হলেও এর মাধ্যমে দ্বীন বিজয়ী হওয়ার বা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। বরং স্বাভাবিকভাবে প্রতিপক্ষের সাথে মুকাবিলা করেই দ্বীনকে বিজয়ী হতে হয়েছে। শেষ নবীর মাধ্যমে আমাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج لَاتَعْلَمُوْنَهُمْ ج اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ ○

"তাদের সার্থকভাবে মুকাবিলার জন্যে তোমরাও যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। আর ঘোড়া সজ্জিত অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় প্রস্তুত থাক, যাতে করে আল্লাহর দুশমন এবং তোমাদের দুশমনকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারো। এদের ছাড়া এমন দুশমনদেরও মুকাবিলা করতে হবে, যাদের কথা তোমরা জান না। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে জানেন। আর আল্লাহর পথে যা কিছুই তোমরা খরচ করনা কেন, তার প্রতিদান তোমরা অবশ্যই পাবে, তোমাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। (সূরা আনফাল ঃ ৬০)

আল্লাহ দ্বীনের সংগ্রাম বিজয়ী হবার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্যই বড় Factor এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আল্লাহর সেই সাহায্য আসার জন্যে প্রস্তুতি সংক্রান্ত তাঁর নির্দেশ যা এখনই আমরা সূরায়ে আনফালের ৬০ নং আয়াতের মাধ্যমে জানতে পারলাম তাঁর উপর আমল করা অপরিহার্য।

ইসলামী আন্দোলনের প্রতিপক্ষের বস্তুগত প্রস্তুতির তুলনায় আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কিছু কমতি থেকে যায়, তাহলে সেই কমতি আল্লাহ তায়ালা তাঁর গায়েবী মদদে পুষিয়ে দিতে পারেন এবং দিয়ে থাকেন সেটা ভিন্ন কথা। সেটার কারণে আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করার বা তাঁর নির্দেশ পালনে শিথিলতা প্রদর্শনের কোন সুযোগ নেই।

উল্লিখিত আয়াত থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে তার সমসাময়িক দুনিয়ার প্রেক্ষিতেই প্রতিপক্ষ চিহ্নিত করতে হবে এবং তার মোকাবিলায় যথার্থ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। প্রতিপক্ষ স্পুটনিকের গতিতে এগুবে আর ইসলামী আন্দোলন শামুকের গতিতে এগুবে এটা চলতে পারে না। এভাবে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় বিজয় লাভ আল্লাহ তায়ালার সুন্নাত বা রীতি বহির্ভূত।

আজকের প্রেক্ষাপটে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিপক্ষের শক্তি সমূহের প্রস্তুতি ও বিভিন্নমুখী কলাকৌশল ও তৎপরতার যথার্থ মুল্যায়ন করে তার মোকাবিলায় ইসলামী আন্দোলনের উপায়-উপকরণ ও বিভিন্নমুখী রসদ সামগ্রী যোগাড় করার প্রয়োজনকে সামনে রাখলে আমাদের বিবেক-বুদ্ধি ইনফাকের যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ ব্যাপারে যথার্থ উপলব্ধি দান করুন-আমিন।

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) এর ভূমিকা

আমরা জানি, নবুওয়াতের ঘোষণা আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মুহাম্মাদ (সা.) আরবের একজন অন্যতম ধনী ব্যক্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী খাদিজাতুল কুবরার (রা.) ব্যবসায়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই তিনি এ অবস্থায় উন্নীত হন। তাছাড়া হযরত খাদিজার সম্পদ ব্যবহারের তাঁর সুযোগ এসেছিল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, নবুওয়াতের ঘোষণা আসার পর হতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাঁর সম্পদ আর বিন্দু পরিমাণও বৃদ্ধি পায়নি। বরং তিলে তিলে সব আল্লাহর পথে নিঃশেষ হয়েছে।

ইনফাকের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামগণের ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালার শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) এর নেতৃত্বে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামগণের (রা.) ভূমিকা দুনিয়ার ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁরা আল্লাহর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে মালের ও জানের কোরবানী পেশের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁদের এই ভূমিকার জন্যে স্বয়ং মহান আল্লাহ সার্টিফিকেট দিয়ে বলেছেন, "তাদের প্রতি আল্লাহ খুশি হয়েছেন আর তাঁরাও আল্লাহর প্রতি খুশি হয়েছে।"

আল্লাহর রাসূলের নিজের হাতে গড়া এই ভাগ্যবান লোকদের একাংশ মুহাজির নামে পরিচিত আর একাংশ আনসার নামে অভিহিত। জান ও মালের কোরবানীর ক্ষেত্রে উভয়ের ভূমিকাই উল্লেখযোগ্য এবং আমাদের জন্যে প্রেরণার উৎস। মক্কার ১৩ বছরে চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাঁদেরকে আল্লাহর রাসূল তৈরি করেছিলেন তাঁদের মালের কোরবানীর মাধ্যমে দুনিয়ার আকর্ষণ এতটা হ্রাস পেয়েছিল যে, আল্লাহর নির্দেশে সবকিছু ছেড়ে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করতে তাঁদের একটুও বাধেনি। বাপ-দাদার ভিটা-মাটিতে যুগ-যুগান্তের ব্যবসা-বাণিজ্য মুহূর্তের মধ্যে লাথি মেরে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে তাঁদের বিন্দুমাত্রও বেগ পেতে হয়নি। অপরদিকে মদীনার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে নতুন হওয়া সত্ত্বেও মক্কা থেকে আগত সহায়-সম্পদ ও সম্বলহীন লোকদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে কোন প্রকারের দ্বিধা-সংকোচ করেননি। মুনাফিক এবং অন্যান্য ইসলাম বিরোধী শক্তির কুমন্ত্রণা এবং প্রচারণা সত্ত্বেও তাঁরা বিভ্রান্ত হননি। এভাবে মক্কার ছিন্নমূল লোকদের মদীনায় পুনর্বাসন করতে না করতে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হয়েছে- বদর-ওহোদের যুদ্ধতো একেবারে লাগালাগি সময়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এতে মদীনাবাসী মুসলমানদের উপর বিরাট অর্থনৈতিক চাপ এসেছে। কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী, আল্লাহর রাসূল ও মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের সাহায্যকারী মদীনার আনসারগণ হাসিমুখেই এ চাপের মোকাবিলা করেছেন। আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে এভাবে তাঁরা বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার মত এত বড় ও মহৎ কাজের তৌফিক দিয়েছিলেন।

সামষ্টিকভাবে মুহাজির ও আনসারগণের কোরবানী বিশেষ করে মালের কোরবানী সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জন্যে যেমন অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য আদর্শ হয়ে থাকবে, তেমনি তাঁদের ব্যক্তিগত ভূমিকাও সবার জন্যে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আমরা এখানে মাত্র কয়েকজনের ভূমিকা অতি সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়াস পাব।

হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রা.) ভূমিকা

শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) এর নবুওয়াতের ঘোষণার সাথে সাথেই যিনি তাঁর প্রতি ঈমান আনেন তিনি হলেন উম্মুল মোমেনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)। তিনি আল্লাহর রাসূলের হেরার গুহার ঘটনা শুনে এবং অরাকা ইবনে নওফলের বক্তব্য শুনে তখনই বুঝেছিলেন যে আল্লাহর রাসূল হিসাবে মুহাম্মদ (সা.) কে যে বিরাট দায়িত্ব দেওয়া হয়ছে এই দায়িত্ব পালন করতে অর্থের প্রয়োজন হবে। তাই তিনি ঈমানের ঘোষণার সাথে সাথে নিজের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাসূলের হাতে সোপর্দ করে দিলেন। প্রকাশ থাকে যে, তিনি ঐ সময় মক্কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। তাঁর সমস্ত সম্পদই আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত সম্প্রসারণ ও দাওয়াত কবুলকারী বিপন্ন লোকদের পেছনে নিঃশেষ হয়েছে।

হযরত আবূ বকর (রা.) এর ভূমিকা

আল্লাহর রাসূলের সর্বশ্রেষ্ঠ সাথী হযরত আবূ বকর (রা.) মক্কার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। আল্লাহর রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম ব্যক্তি। তিনি আল্লাহর রাসূলের সকল দুঃসময়ে সাথী হিসাবে যেমন জীবনের ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করেননি, তেমনি এ পথে অকাতরে অর্থ বিলাতেও কুণ্ঠিত হননি। রাসূলের মক্কী জিন্দেগীতে আল্লাহর দ্বীনের জন্যে, দ্বীন কবুলকারী দুঃস্থ অসহায় ক্রীতদাস শ্রেণীর লোকদের আযাদ করা ও পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্যে যেমন তিনি অর্থ ব্যয় করেছেন তেমনি মদীনার জীবনে আল্লাহর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর সর্বস্ব আল্লাহর রাসূলের হাতে তুলে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ যখন নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা দিলেন, আবূ বকরের নিকট তখন চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল। ইসলামের জন্য তিনি তার সকল সম্পদ ওয়াকফ

করে দেন। কুরাইশদের যে সব দাস-দাসী ইসলাম গ্রহণের কারণে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হচ্ছিল, এ অর্থ দ্বারা তিনি সেই সব দাস-দাসী খরিদ করে আযাদ করে দেন। তেরো বছর পর যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) সাথে তিনি মদীনায় হিজরত করেন তখন তার কাছে এ অর্থের মাত্র আড়াই হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। অল্প দিনের মধ্যেই অবশিষ্ট দিরহামগুলিও ইসলামের জন্য ব্যয়িত হয়। বিলাল, খাব্বাব, আম্মার, আম্মারের মা সুমাইয়া, সুহাইব, আবু ফুকাইহ (রা.) প্রমুখ দাস-দাসী তারই অর্থের বিনিময়ে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করেন। তাই পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আমি প্রতিটি মানুষের ইহসান পরিশোধ করেছি। কিন্তু আবূ বকরের ইহসান এমন যে, তা পরিশোধ করতে আমি অক্ষম। তার প্রতিদান আল্লাহ দেবেন। তার অর্থ আমার উপকারে যেমন এসেছে, অন্য কারো অর্থ তেমন আসেনি। তাবুক অভিযানে তিনি ছিলেন মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী। এ অভিযানের সময় রাসূলুল্লাহর (সা.) আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাড়ীতে যা কিছু অর্থ সম্পদ ছিল সবই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা.) হাতে তুলে দেন। আল্লাহর রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলেমেয়েদের জন্য বাড়ীতে কিছু রেখেছো কি?" জবাব দিলেন "তাদের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই যথেষ্ট।"

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য কোরবানীর ক্ষেত্রে হযরত উমার (রা.) ছিলেন-অগ্রগামী। ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ ও এর বিজয়ের জন্য তাঁর বীরত্ব যেমন ইতিহাসের পাতায় প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে- তেমনি অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রেও তা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ ব্যাপারে তিনি সব সময়ই প্রতিযোগিতা করতেন।

তাবুক অভিযানের সময় রাসূলুল্লাহর (সা.) আহ্বানে সাড়া দিয়ে হযরত উমার (রা.) তার মোট সম্পদের অর্ধেক রাসূলুল্লাহর (সা.) হাতে তুলে দেন। এ অভিযানের সময় হযরত আবূ বকর (রা.) এর নজীরবিহীন কোরবানী দেখে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, দ্বীনের জন্য কোরবানীর ক্ষেত্রে আবূ বকরকে (রা.) কেউ হারাতে পারবে না।

হযরত উসমান (রা.)

হযরত ওসমান (রা.) ছিলেন কুরাইশদের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন মক্কার অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি। মক্কার সমাজে একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি 'গণী' উপাধি লাভ করেন।

ইসলামী আন্দোলনের জন্য হযরত উসমানের অবদান মুসলিম জাতি কোন দিন ভুলতে পারবে না। ইসলামের সেই সংকটকালে আল্লাহর রাস্তায় তিনি যেভাবে খরচ করেছেন, অন্য কোন ধনাঢ্য মুসলমানের মধ্যে তার কোন নজীর নেই। তিনি বিস্তর অর্থের বিনিময়ে ইয়াহুদী মালিকানাধীন 'বীর রুমা' কূপটি খরিদ করে মদীনার মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। বিনিময়ে রাসূল (সা.) তাঁকে জান্নাতের অঙ্গীকার করেন। তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালেও তিনি এক্ষেত্রে উত্তম নজীর পেশ করেন। এ যুদ্ধের এক তৃতীয়াংশ সৈন্যের যাবতীয় ব্যয়ভার উসমান নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। তিনি সাড়ে নয় শো উট ও পঞ্চাশটি ঘোড়া সরবরাহ করেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, তাবুকের বাহিনীর পেছনে হযরত উসমান এত বিপুল অর্থ ব্যয় করেন যে, তার সমপরিমাণ অর্থ আর কেউ ব্যয় করতে পারেনি। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাবুকের প্রস্তুতির জন্য উসমান কোঁচড়ে করে এক হাজার দীনার নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহর (সা.) কোলে ঢেলে দেন। রাসূল (সা.) খুশিতে দিনারগুলি উল্টে পাল্টে দেখেন এবং বলেন ঃ আজ থেকে উসমান যা কিছুই করবে কোন কিছুই তার জন্য ক্ষতিকর হবে না। এভাবে অধিকাংশ যুদ্ধের প্রস্তুতির সময়ে তিনি প্রাণ খুলে অর্থ প্রদান করতেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, তাবুকের যুদ্ধে তাঁর দানে সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল (সা.) তাঁর আগে-পিছের সকল গুণাহ মাফের জন্য দু'আ করেন এবং তাকে জান্নাতের ওয়াদা করেন।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)

ইসলামী আন্দোলনের জন্য সকল সাহাবীই তাদের জান-মাল কোরবানী করতে কখনও কার্পণ্য দেখাননি। বরং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তারা পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করেছেন। কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই তাদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর পথে খরচ করেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। মক্কায় তিনি ধনাঢ্য ব্যক্তি না হলেও হিজরতের পর মদীনায় ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে তার প্রভূত আর্থিক উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ে তিনি কখনো কার্পণ্য প্রদর্শন করেননি। বরং এ পরীক্ষায়ও তিনি উত্তীর্ণ হন।

নবম হিজরীতে তাবুক অভিযানের সময় মুসলমানগণ যে ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হন সে পরীক্ষায়ও তিনি কৃতকার্য হন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আবেদনে সাড়া দিয়ে এ অভিযানের জন্য হযরত আবূ বকর, উসমান ও আবদুর রহমান রেকর্ড পরিমাণ অর্থ সাহায্য করেন। আবদুর রহমান (রা.) আট হাজার দিনার রাসূলুল্লাহর (সা.) হাতে তুলে দিলে মুনাফিকরা কানাঘুষা শুরু করে দেয়। তারা বলতে থাকে, "সে একজন রিয়াকার-লোক দেখানোই তার উদ্দেশ্য।" তার জবাবে আল্লাহ বলেন, "এতা সেই ব্যক্তি যার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হতে থাকবে।" (সূরা আত-তওবা ঃ ৭১)

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, উমার (রা.) তাঁর এ দান দেখে বলে ফেলেন, 'আমার মনে হচ্ছে আবদুর রহমান গুণাহগার হয়ে যাচ্ছে। কারণ, সে তার পরিবারের লোকদের জন্য কিছুই রাখেনি।' এ কথা শুনে রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করেন, 'আবদুর রহমান, পরিবারের জন্য কিছু রেখেছ কি'? তিনি বলেন, 'হ্যাঁ। আমি যা দান করেছি- তার থেকেও বেশি ও উৎকৃষ্ট জিনিস- তাদের জন্য রেখেছি।' রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'কত'?
বললেন, 'আল্লাহ ও তার রাসূল যে রিযিক, কল্যাণ ও প্রতিদানের অঙ্গীকার করেছেন, তাই'।

মুহাজির ও আনসারদের ভূমিকা

জাহেলিয়াতের চরম অন্ধকার যুগে মক্কায় যারা ঈমান এনে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সংগী-সাথী হয়েছিলেন- দ্বীনের জন্য তাদের আত্মত্যাগ-কোরবানী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এ ঈমানের ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথেই বহুমুখী বিপদ-মুছিবত তাদের উপর আপতিত হয়। জুলুম-নির্যাতনের ষ্টীম রোলার তাদের উপর চালানো হয়। রুটি-রোজগরের সকল পথই তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। যারা ধনী বা সচ্ছল ছিলেন ইসলামী দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে তাদের অবস্থাও ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে থাকে। কিন্তু সকল কিছুকে উপেক্ষা করে তারা ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দ্বীনের জন্য, দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য তারা সকলেই জান-মাল অকাতরে বিলিয়ে দেন। এ ব্যাপারে তাদের কোন আক্ষেপ তো ছিলই না বরং এ ক্ষেত্রেও তাদের প্রতিযোগিতা ছিল ঈর্ষা করার মত নজিরবিহীন।

তারা নিজের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও জীবন হক পথে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং হকের ঝান্ডা উড্ডীন রাখার জন্য যে কোন ধরনের কোরবানী দিতে পিছপা হননি। এমনকি নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে হলেও নবুওয়ত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে মদীনায় হিযরতের নির্দেশ দেন। নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথেই তারা তাতে সাড়া দিলেন এবং প্রিয় স্বদেশভূমি, ধন-সম্পদ এবং ঘরবাড়ি ত্যাগ করে মদীনায় গিয়ে পৌঁছলেন। মক্কায় বছরের পর বছর ধরে অকথ্য জুলুম নির্যাতন সহ্যের পর-নিজের পরিবার-পরিজন, ঘরবাড়ী এবং ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যখন মদীনায় পৌঁছলেন তখন তাঁদের কাছে আল্লাহর নাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

কিন্তু মদীনার আনসাররা যে ভালবাসা এবং নিষ্ঠা ও সততার সাথে এ দেশ ত্যাগীদের মেহমানদারী করলেন তা এক ঈমান প্রজ্জ্বলিত কাহিনী। তারা সহায় সম্বলহীন এ মুহাজিরদেরকে ভাই-হিসেবে গ্রহণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। সূরায়ে আলে-ইমরানে ইরশাদ হয়েছে ঃ 'অতঃপর তিনি-তোমাদের অন্তরে (পারস্পরিক) ভালবাসা সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।'

আনসাররা আল্লাহ তাআলার এ মহান ইহসানের পুরোপুরি শোকর আদায় করলেন। তারা নিজের জীবন, সম্পদ এবং সন্তানদেরকে হক পথে ওয়াকফ করে দিলেন। নবী করীম (সা.) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কায়েম করলেন। এ সম্পর্কে সৃষ্টির পর তাঁরা পাতানো ভাইদের সাথে আপন ভাইয়ের চেয়েও সুন্দর ব্যবহার করলেন এবং তাদের ধন-সম্পদ সবকিছু সমান ভাগে ভাগ করে দিলেন। এটা তারা করেছিলেন শুধুমাত্র দ্বীনের জন্য, দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। জিহাদের ডাক এলেই তারা নিজেদের জান এবং মাল সমেত-ইসলামের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে যেতেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এ গুণের বদৌলতেই আল্লাহর প্রিয় ও পছন্দনীয় হতে পেরেছিলেন। কুরআন পাকে প্রকাশ্য ভাষায় বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ তাদের প্রতি-সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।"

বর্তমান যুগে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিপক্ষ ও তাদের প্রস্তুতি

ইসলামী আন্দোলনের যথার্থ প্রস্তুতি নিতে হলে বর্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে এ আন্দোলনের প্রতিপক্ষ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে। তাদের প্রস্তুতিরও যথার্থ মূল্যায়ন করতে হবে।

ইসলামী আন্দোলন বর্তমান বিশ্বে যে দেশেই পরিচালিত হোকনা কেন তার প্রধান প্রতিপক্ষ দুই পরাশক্তি-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিপক্ষ হল তাদের প্রভাব বলয়াধীন রাষ্ট্রশক্তি ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহ। বাংলাদেশের জন্যে ঐ দুই প্রধান প্রতিপক্ষের সাথে আর একটি বাড়তি প্রতিপক্ষ হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে আমাদের নিকট প্রতিবেশী একটি পাতি বৃহৎ শক্তি। এই প্রতিপক্ষ সার্বিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে দুনিয়ার সর্বত্র ইসলামের পুনর্জাগরণ ঠেকানোর জন্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তাদের পারস্পরিক স্বার্থের, দ্বন্দ্বের কারণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে মতপ্রার্থক্য থাকলেও ইসলামের ইস্যুতে প্রায় সর্বত্র তারা এক ও অভিন্ন ভূমিকা পালন করে আসছে। গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজির কারণে কোথাও কোথাও কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পরিলক্ষিত হলেও সেটা বাহ্যিক ব্যাপার মাত্র। মূলে ইসলামী পুনর্জাগরণ ও আন্দোলনে ঠেকানোর ব্যাপারে তাদের কোন শৈথিল্য নেই। তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে তাঁরা বিশ্বের প্রচার মাধ্যমসমূহ ইহুদীদের সহায়তায় ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে বিশ্ব-জনমতকে প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত করার প্রয়াস চালাচ্ছে।

মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে চিন্তার বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্যে রীতিমত Intelectual and cultural Agression (বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন) চালাচ্ছে। বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে তাদের মানসিক গোলামে পরিণত করছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নামে প্রশাসনকে পর্যন্ত ব্যবহার করছে। এনজিওদের জাল বিস্তার করে সামাজিকভাবে প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টার পাশাপাশি আমাদের স্বকীয় মূল্যবোধ ধ্বংসের অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। সেই জালে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত সহযোগিতা দিয়ে তাদের পক্ষে রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এবং তাদের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের উপর সরাসরি আঘাত হানার ব্যবস্থা করছে।

এদের বহুমুখী রণকৌশলকে সামনে রেখে ইসলামী আন্দোলনের কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে দুনিয়ার কোন শক্তি না বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে সাহায্য করতে পারে, না বস্তুগত দিক দিয়ে কোন সহযোগিতা করতে পারে। আল্লাহর উপর ভরসা করে ইসলামী আন্দোলনের নিজস্ব জনশক্তিকেই এর প্রস্তুতি গ্রহণে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হবে। সেই সাথে সাধ্যমত ইসলামী জনতাকে সহায়ক শক্তি হিসাবে পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে।

সে- দিনে মুহাম্মদ (সা.) এর সাথীদের তুলনায় তাঁর প্রতিপক্ষ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। ধনবল ও জনবলে বলিয়ান ছিল। মদীনায় হিজরতের পর প্রতিপক্ষের সংখ্যা আরো বৃদ্ধিই পেয়েছে। মক্কায় থাকা অবস্থায় প্রতিপক্ষ বলতে ছিল মক্কার প্রভাবশালী, সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের প্রভাবাধীন জনগণ। মদীনায় হিজরতের পর সেখানকার ভেতর থেকে প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ানো মুনাফিক গোষ্ঠী ও ইহুদীদের শক্তি।

তার-সাথে বাড়তি প্রতিপক্ষ হিসাবে সামনে এলো রোম সাম্রাজ্যবাদ ও পারস্য সাম্রাজ্য, যাদেরকে আধুনিক বিশ্বের দুই পরাশক্তি আমেরিকা ও রাশিয়ার সাথে তুলনা করা যায়। ইতিহাস সাক্ষী, এইসব প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় আল্লাহর রাসূল (সা.) প্রস্তুতি গ্রহণ করতে গিয়ে নিজস্ব জনশক্তির বাইরে কারও সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হননি।

যারা ঈমান এনেছে, তারাই এ আন্দোলনের জনশক্তিতে পরিণত হয়েছে, তারাই প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় যেমন জানকে বাজি রেখে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়েছে, তেমনি এ লড়াইয়ের যাবতীয় উপায়-উপকরণ ও রসদ সামগ্রী যোগাড় করার জন্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে মালের কোরবানী পেশ করেছে।

আমাদের আজকের ইসলামী আন্দোলন মূলতঃ আল্লাহর রাসূল (সা.) পরিচালিত সেই আন্দোলনেরই উত্তরসূরী। দুনিয়ার আর কোন আন্দোলনের সাথে এর সামান্যতম সামঞ্জস্যও নেই। অতএব আল্লাহর রাসূল ও তাঁর হাতে গড়া সাথী-সঙ্গীদের সৃষ্টি করা সেই ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করতে পারলেই এ আন্দোলনের নিজস্ব শক্তি ও গতি সৃষ্টি হবে এবং ধাপে ধাপে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে।

আল্লাহর রাসূল এবং সাহাবায়ে কেরামগণের সেই ঐতিহ্যের অনুসরণে আজকের দিনে আল্লাহর কিছু বান্দার পক্ষ থেকে যেমন শহীদী খুনের নজরানা পেশ করা সম্ভব হচ্ছে, অন্য কথায় জানের কোরবানী পেশ করা সম্ভব হচ্ছে-তেমনি তাঁদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে হযরত খাদিজা, আবু বকর, উমার ও উসমান (রা.) এর মত আর্থিক কোরবানীর নজির স্থাপনের জন্য আল্লাহর কিছু বান্দাদের এগিয়ে আসা কি অসম্ভব?

ইসলামের অর্থ ব্যয়ের বিভিন্ন দিক

ইসলাম ও ঈমানের মূল দাবীই যেহেতু আল্লাহর কাছে জান ও মাল সোপর্দ করার। ইসলামের বাস্তব কাজ যেহেতু আল্লাহর এবাদত এবং বান্দাদের সেবা করা, সেহেতু মুসলিম সমাজের বিভিন্ন দিকে ও বিভাগে অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা ঐতিহ্যগতভাবেই প্রাধান্য পেয়ে আসছে। 'নদী মরে গেলেও রেখা থাকে' এই প্রবাদ বাক্যের মতই মুসলিম সমাজ তার নিজস্ব মূল্যবোধ প্রায় হারিয়ে ফেললেও তাদের অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা বা ঐতিহ্য একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

ইসলাম অর্থ-সম্পদের কোরবানীর দু'ধনের ব্যবস্থা রেখেছে। একটা বাধ্যতামূলক যেমন- যাকাত। অপরটি স্বেচ্ছামূলক। যেমন- গরীব, নিকট আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে দুঃস্থ অসহায় মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা করা। কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন- মসজিদ, মাদরাসা প্রভৃতি কায়েমের কাজে অর্থ ব্যয় করা। স্বেচ্ছায় নিঃস্বার্থভাবে অর্থ ব্যয়ের মন-মানসিকতা তৈরির ক্ষেত্রে অবশ্য বাধ্যতামূলক দান যাকাতের একটা ভূমিকা আছে। বরং সত্যি বলতে কি? প্রতিদানের আশা ছাড়া, কোন বৈষয়িক স্বার্থ ছাড়া মানুষ অর্থ ব্যয়ে অভ্যস্ত হোক এটা যাকাতের একটা অন্যতম উদ্দেশ্য।

যাই হোক, বাধ্যতামুলক দান অর্থাৎ যাকাতের যে আটটি খাত আছে তার মধ্যেও ফি সাবিলিল্লাহর একটা খাত আল্লাহ রেখেছেন। মানুষ স্বেচ্ছামূলকভাবে যে বিভিন্ন খাতে অর্থ ব্যয় করে থাকে, তার মধ্যেও ফি সাবিলিল্লাহর খাতে বা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অর্থ ব্যয়ের সুযোগ আছে। শুধু সুযোগ আছে তাই নয় বরং আল্লাহর কোরআন এবং রাসূলের হাদীসের আলোকে বিচার করলে দেখা যায়, আল্লাহর পথে জিহাদ হলো সর্বোত্তম আমল। অতএব এই সর্বোত্তম আমলের জন্যে অর্থ ব্যয় হবে সর্বোত্তম খাতে অর্থ ব্যয়- এটাই স্বাভাবিক।

যেই দেশে আল্লাহর দ্বীন কায়েম নেই সেখানে যাকাতের আটটি খাতের মধ্যে থেকেও ফি সাবিলিল্লাহর খাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আল্লাহর দ্বীন কায়েম না হলে যাকাতের উদ্দেশ্যেই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে সর্বাবস্থার সর্বক্ষেত্রে দানের সকল দিক ও বিভাগের তুলনায় আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে দান করাই সর্বোত্তম দান। যে কোন দানের তুলনায় এ

কাজের দানে সওয়াব হবে সবচেয়ে বেশি। ইসলামের এই শিক্ষাটা আমরা ভুলতে বসেছি বলেই আজ ইসলামী আন্দোলনের কাজে পয়সা দেওয়াকে অনেকে রাজনৈতিক দলে চাঁদা দেয়ার শামিল মনে করে। সর্বোত্তম সওয়াবের কাজতো দূরের কথা, আদৌ সওয়াব হয় কিনা এ সম্পর্কেই সন্দেহ-সংশয় পোষণ করেন। অথচ আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা ঃ

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ۝ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে এমন ব্যক্তিদের কাজের সমান মনে করে নিয়েছো যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং সংগ্রাম-সাধন করেছে আল্লাহর পথে? এ উভয় দল আল্লাহর কাছে সমান নয়। আল্লাহ জালিমদের পথ দেখান না।

আল্লাহর কাছে তো তারাই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যারা ঈমান এনেছে এবং তার পথে ঘরবাড়ী ছেড়েছে ও ধন-প্রাণ সমর্পণ করে জিহাদ করেছে। তারাই সফলকাম। তাদের রব তাদেরকে নিজের রহমত, সন্তোষ ও এমন জান্নাতের সুখবর দেন, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অবশ্যি আল্লাহর কাছে কাজের প্রতিদান দেয়ার জন্য অনেক কিছুই রয়েছে।" (সূরা আত-তাওবা ঃ ১৯-২২)

আল্লাহর দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে অর্থ ব্যয় সওয়াবের দৃষ্টিতে যেমন সর্বোত্তম কাজ তেমনি বাস্তবতার আলোকেও এ পথে অর্থ ব্যয়টাই কার্যকর এবং অর্থবহ। আমরা নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরি কাজে অর্থ ব্যয় করি এটা নিঃসন্দেহে ভাল কাজ-সওয়াবের কাজ। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন কায়েম না হলে এই মসজিদেতো সত্যিকার অর্থে নামায কায়েম হবে না। আমরা মাদরাসার জন্যে খরচ করে থাকি। আরো খরচ করা উচিত কিন্তু আল্লাহর দ্বীন কায়েম না হল এই শিক্ষা আমাদের সমাজে যথার্থ গুরুত্ব যেমন পাবে না, তেমনি এ শিক্ষা বাস্তবে কোন কাজেও লাগবে না। আমরা ইয়াতিমখানা তৈরি করে সমাজের এতিমদের পুনর্বাসনের কাজে ব্যয় করে থাকি। এটাও নিঃসঙ্গেহে একটা সওয়াবের কাজ এবং সেবামূলক কাজ। কিন্তু সমাজের সকল ছিন্নমূল ও অভাবগ্রস্ত লোকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের কাজটিতো ইসলামী সমাজ বিপ্লবের আগে মোটেই সম্ভব নয়। আমরা আমাদের সকল সম্পদ ব্যয় করেই যদি অভাবী লোকদের অভাব পূরণ করতে যাই, তাহলে দেখা যাবে এসব চেষ্টা নিষ্ফল ও অনুৎপাদনমুখী। এভাবে সওয়াবের নিয়তে এবং মানবতার সেবার নিয়তে আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতা দানের যতটুকু রেওয়াজ চালু আছে এটা নিঃসন্দেহে একটা ভাল দিক। এইভাবে যারা দান-খয়রাত করে অভ্যস্ত তাদের দান-খয়রাতকে আল্লাহ কবুল করুন। এই দোয়ার সাথে সাথে আমরা এ দোয়াও করি যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সর্বোত্তম খাতে, অর্থবহ খাতে ও উৎপাদনমুখী খাতে অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অর্থ ব্যয়ের তৌফিক দিন, তাদের এ পথে অর্থ ব্যয়ের যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করার তৌফিক দিন। আমীন।

ইনফাকের ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনের ঐতিহ্য

ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্নমুখী ঐতিহ্য সৃষ্টিতে প্রধানতঃ অবদান রেখেছেন আম্বিয়ায়ে কেরামগণ (আ).। এরপর আল্লাহর সেইসব বান্দাদের ভূমিকা স্মরণযোগ্য যাদেরকে আল কোরআনে সিদ্দিকীন, সালেহীন এবং শোহাদা নামে অভিহিত করা হয়েছে। আমরা এই পুস্তিকার চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে খুব সংক্ষেপে হলেও শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং সাহাবায়ে

কেরামগণের ভূমিকা আলোচনা করে এসেছি। তাঁদের ভূমিকা আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস হওয়া সত্ত্বেও মনের কোণে প্রশ্ন জাগতে পারে। নবীদের ব্যাপার তো আলাদা, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর ব্যাপার তো আরো ব্যতিক্রম। নবীদের সাথী-সঙ্গীদের ব্যাপারও আলাদা। কাজেই দূর অতীতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পাশাপাশি নিকট অতীতের বা আজকের সমসাময়িক বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস-ঐতিহ্যই এ ক্ষেত্রে বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে।

নিকট অতীতে আমাদের উপমহাদেশে হযরত সৈয়দ আহাম্মদ শহীদ ব্রেলভী পরিচালিত মুজাহিদ আন্দোলনের কথা আমাদের মোটামুটি জানা থাকার কথা। এই আন্দোলনে বাংলার তৌহিদী জনতা যেমন পায়ে হেঁটে যোগদানের রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন, তেমনি অকাতরে এই আন্দোলনের জন্যে আর্থিক সহযোগিতাও করেছেন। বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে মুজাহিদ আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজনের বসবাস ছিল সেইসব অঞ্চলের লোকদের মধ্যে এখনও ওশর দান থেকে শুরু করে বিভিন্ন দ্বীনি খেদমতে স্বতস্ফূর্তভাবে দানের রীতি চালু দেখা যায়। আজকের বিশ্বের দু'টি আন্তর্জাতিক মর্যাদা সম্পন্ন ইসলামী সংগঠন জামায়াতে ইসলামী ও জামায়াতে ইখওয়ানুল মুসলমিনের প্রতিষ্ঠাতা ও এর সাথে জড়িত ব্যক্তিরা সাহাবায়ে কেরামগণের জানের কোরবানী ও মালের কোরবানীর ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পাচ্ছেন। সাহাবায়ে কেরামগণ ঈমানের ঘোষণা দিয়ে যেভাবে জুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন, ইসলামী আন্দোলনে শরীক লোকেরা দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে অনুরূপ জুলুম ও নির্যাতনেরই সম্মুখীন হচ্ছেন। তাঁরা যেভাবে অর্থ-সম্পদ এ পথে ব্যয় করতেন আজকের যুগের ইসলামী আন্দোলনের লোকেরাও অনুরূপ ত্যাগ, কোরবানীর প্রয়াস পাওয়ার চেষ্টা করছে। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) তাঁর অসংখ্য বই-পুস্তকের আয় থেকে কোটিপতি হতে পারতেন কিন্তু তাঁর মধ্য থেকে মাত্র ২/৩টি বইয়ের আয় পরিবারের জন্যে রেখে বাদবাকী সমস্ত বইয়ের (যার অসংখ্য সংস্করণ ছাপা হচ্ছে। অসংখ্য ভাষায় যার অনুবাদ ও প্রকাশ হয়েছে) ইসলামী আন্দোলনকে ওয়াকফ করেছেন। তাঁর সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তাঁরা অনেকেই

জীবনের কেরিয়ার এই আন্দোলনের জন্যে কোরবানী দিয়েছেন। অনেকেই অর্থনৈতিক কোরবনীর ক্ষেত্রে নিজ নিজ আয়ের শতকরা ৫ ভাগ থেকে শুরু করে ১০ ভাগ, ২০ ভাগ পর্যন্ত জামায়াতের বাইতুলমালে দেওয়ার ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন।

এই ঐতিহ্যের অনুসরণের মাধ্যমে আজকের ইসলামী আন্দোলনে অর্থ-সম্পদের কোরবানীর ক্ষেত্রে দু'টো নিয়মের অনুসরণ হয়ে আসছে। অবশ্য এটাকে ফরয ওয়াজেব হিসাবে গণ্য করা হয় না।

আমাদের সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে জামায়াতে এমন লোকদের সংখ্যাই বেশি। তাই মোটামুটি হিসাবে এই পর্যায়ের লোকদের আয়ের শতকরা পাঁচ ভাগ দিলে তা কোরবানী বা ইনফাকের পর্যায়ে পড়ে। অতএব ঐতিহ্যগতভাবে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা নিজ নিজ আয়ের কমপক্ষে শতকরা পাঁচ ভাগ জামায়াতের বাইতুলমালে দিয়ে আসছেন। এটা নিম্ন মধ্যবিত্তদের বেলায়ই প্রয়োজ্য। যারা উচ্চ মধ্যবিত্তদের পর্যায়ে পড়েন তাঁদের আয়ে শতকরা পাঁচ ভাগ কোরবানীর পর্যায়ে পড়তে পারে না।

আমাদের মধ্যে দ্বিতীয় যে ঐতিহ্যটি অনুসরণ করা হয়, তাহলো নিজের পারিবারিক ও সাংসারিক খরচে সংগঠনকে পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে শামিল করে সমস্ত ব্যয় মাথাপিছু বন্টন করলে সংগঠনের ভাগে যতটা পড়ে ততটা বাইতুলমালে দেওয়ার চেষ্টা করা। এই রীতি অনুসরণ করলে ইনফাকের অর্থ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজের ভরণ পোষণ বা পৃষ্ঠপোষকতা করা এর প্রতি খেয়াল রেখে অর্থ ব্যয়ের অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে।

লেখকের অন্যান্য বই

১. গণতন্ত্র গণবিপ্লব ও ইসলামী আন্দোলন
২. পঞ্চম জাতীয় সংসদে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর আটটি ভাষণ
৩. জাতীয় সংসদে বক্তৃতামালা
৪. রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে
৫. কুরআন রমযান তাকওয়া
৬. ইসলামী আন্দোলন চ্যালেঞ্জ ও মোকাবেলা
৭. ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়
৮. আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
৯. কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন
১০. আল কুরআনের পরিচয়
১১. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন
১২. দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব
১৩. ইসলামী আন্দোলন ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা
১৪. ইসলামী সমাজ বিপ্লব
১৫. রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম বনাম ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি
১৬. ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের উপর ভাষণ
১৭. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামকে সচেতন থাকতে হবে
১৮. এক পরাশক্তির অন্যায় যুদ্ধ আতঙ্কিত করেছে বিশ্বের মানুষকে
১৯. ৮ম জাতীয় সংসদের ৪টি ভাষণ
২০. মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য
২১. ইসলামী আন্দোলনে কর্মীর কাজ